রাজনৈতিক ডায়েরি

সুলতান আবদুল হামিদ রহ.-এর

রাজনৈতিক ডায়েরি

উসমানি খেলাফতের পতনের ঐতিহাসিক দলিল : এক

১৮৯১-১৯০৮

মাহদি হাসান অনূদিত

নাশাত

রাজনৈতিক ডায়েরি
মূল : সুলতান আবদুল হামিদ রহ.
অনুবাদ : মাহদি হাসান

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৮৪১৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ

মূল্য : ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

ISBN : 978-984-97764-2-0

সুলতান আবদুল হামিদ রহিমাহুল্লাহুর প্রতি।
মুসলিম উম্মাহর এই দরদী অভিভাবককে
আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন।

যা না বললেই নয়

১৮৭৬ সালে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ যখন ক্ষমতাগ্রহণ করেন, পুরো উসমানি খেলাফত তখন নানা ব্যাধি ও বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মুখে। তার অবস্থা হয়ে যায় রুগ্‌ণ ব্যক্তির মতো। সেই ধ্বংসের কিনার থেকে রুগ্‌ণ উসমানি খেলাফতকে একাই টেনে তোলার চেষ্টা করেন এই মহান খলিফা। তিন দশকব্যাপী তার শাসনামল ছিল নানা চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতায় ভরপুর। খেলাফতকে তখন ঘিরে রেখেছিল অসংখ্য ষড়যন্ত্রের জাল। কিন্তু এতসব প্রতিকূলতার সম্মুখেও নির্ভয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আসলে তার ব্যক্তিত্বই ছিল এমন। তার সচেতনতা, দূরদর্শিতা, দায়িত্বশীলতা, আত্মমর্যাদাবোধ, ধর্মভীরুতা এবং খোদাভীরুতা কিছুতেই তাকে পাশ্চাত্যের নানামুখী ষড়যন্ত্রের সম্মুখে নতি স্বীকার করতে দেয়নি। দুর্বল ও প্রায় নিঃস্ব সাম্রাজ্যকে তিনি নিজের দূরদর্শী ও সুদূরপ্রসারী কর্মপন্থা আর পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্রমেই উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যা তার প্রবল বিরোধীরাও স্বীকার করতে বাধ্য। আধুনিক সময়ে এসে নিজেদের সম্মান, আভিজাত্য ও স্বকীয়তা অবলীলায় বিলিয়ে দেয়া হাজারও মুসলিমের ভীড়ে একজন আবদুল হামিদ তাই অমর হয়ে থাকবেন তার ইস্পাতসম দৃঢ়তায়, অকুতোভয় মানসিকতায়, সর্বোপরি ইসলামি ঐক্যের দরদি ও জাগ্রত চিন্তায়।

এই বইটি সুলতানের নিজস্ব চিন্তার বুননের অমর স্বাক্ষর। এটিকে বলা যায় সুলতানের স্মৃতিকথার প্রথম কিস্তি। দ্বিতীয় কিস্তিটি ইতোমধ্যে 'নির্বাসিতের জবানবন্দি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই বইয়ের বিষয়গুলো রাজনীতিঘনিষ্ঠ। তৎকালীন সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যকে ঘিরে যে রাজনৈতিক ডামাডোল তৈরি হয়েছিল, সুলতানকে ঘিরে আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলো যে ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচারের ধ্বংসলীলায় মেতেছিল, এসবের নির্মোহ চিত্রায়ণ ফুটে উঠেছে সুলতানের স্মৃতিকথায়। উসমানি সাম্রাজ্যকে ঘিরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেসব মিথ্যাচার ও আপত্তির চর্চা হচ্ছে প্রতিনিয়ত, এই বইয়ে পাওয়া যাবে সেগুলোর সত্যনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ জবাব।

সুলতান আবদুল হামিদ তার রাজনৈতিক ভাবনায় ইউরোপীয় ক্রুসেডার, জায়নবাদী ইহুদি এবং জাতীয়তাবাদী তুর্কি এই তিনটি অপশক্তির চক্রান্ত উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়াও সুলতান আবদুল হামিদকে নিয়ে যত সমালোচনা ও নেতিবাচক চর্চা হয়েছে, তিনি সবকিছুরই বলিষ্ঠ জবাব দিয়েছেন। তাই এই বইয়ের ছত্রে ছত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে একজন সৎ, নির্ভীক, নির্মল বিশ্বাসের অধিকারী, জাতির পরিত্রাণের চিন্তায় মগ্ন দরদি অভিভাবক এবং একজন মহান সংস্কারকের পরিচয়।

এই বইটি এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি আধুনিক ইতিহাসে অন্ধকারে পড়ে থাকা একটি প্রান্তে আলো প্রক্ষেপণ করবে। পাঠকের সামনে পেশ করবে মতানৈক্যের

চোরাবালিতে আক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তিমূলক জবাব। সত্যসন্ধানী ইতিহাস গবেষকদের জন্য বইটি হবে কালজয়ী দলিল। পথ দেখাবে গভীর অনুসন্ধান ও সত্যাশ্রয়ী ইতিহাসকে নথিবদ্ধ করার প্রতি। এই বইটি পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে উন্মোচিত হবে এক নতুন আলোর দিগন্ত। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের জীবন ও শাসনামল নিয়ে উত্থাপিত বহু আপত্তি ও মিথ্যাচারের কাঙ্ক্ষিত জবাব পাবে সত্যপিপাসু পাঠকের মন, সমালোচক ও মিথ্যাচারকারীদের জন্য যা হবে চরম চপেটাঘাত।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে আরবি থেকে। সুলতান আবদুল হামিদ তার এই ভাবনাগুলো ১৯০৯ সালের পর তুর্কি ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন; অর্থাৎ, যখন কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস তাকে বরখাস্ত করে দেয়। সুলতানের জীবদ্দশাতেই সাইয়েদ আলি আল-ওহাবি সেগুলো একত্র করে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন। তার সেই ফরাসি অনুবাদ ফের তুর্কি ভাষায় রূপান্তর করে প্রকাশ করা হয় ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। অতঃপর আরবি ভাষার প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ গ্রন্থটির আরবি অনুবাদ প্রকাশ করে। আমি সেই আরবি সংস্করণ থেকেই বইটি অনুবাদ করেছি।

উসমানি খেলাফতের ইতিহাস নিয়ে ইদানীং বাংলাভাষায় যে চর্চা শুরু হয়েছে, এই বইটি সেই অঙ্গন সমৃদ্ধ করবে আশাকরি। পাঠক যেন স্বাচ্ছন্দ্য পাঠ বজায় রাখতে পারেন, অনুবাদের সময় সেটি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও পাঠকের চোখে কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর আবেদন রইল।

কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ আহসান ইলিয়াস সাহেবের প্রতি। বই নির্বাচন, প্রকাশ ও আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়ার সব কৃতিত্ব তিনিই পাবেন। সবশেষে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করছি তিনি যেন বইটি সমাদৃত করেন এবং সংশ্লিষ্ট সবার জন্য আমালে সালিহ হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

মাহদি হাসান

১০-১০-২-২২

প্রথম অধ্যায় : অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

ইয়াং তুর্ক মুভমেন্ট ও সংবিধান : ১৫
আর্মেনীয়দের অবান্তর অভিযোগ : ১৬
অভ্যন্তরীণ অভিবাসন : ১৭
সংবিধান : ১৭
ইহুদি সংকট : ১৯
বুরসা ও কেন্দ্রীয় শাসন : ২১
হাদিয়া-বখশিশসংক্রান্ত সমস্যা : ২১
বনাঞ্চলের সুরক্ষা : ২৩
আর্মেনীয় সংকট : ২৩
ইয়াং তুর্ক : ২৫
কুর্দি ও আর্মেনীয় গোষ্ঠী : ২৬
আর্মেনীয় জাতিগোষ্ঠী ও ব্যবসাখাত : ২৭
আর্মেনীয় সংকট প্রসঙ্গে জার্মান মধ্যস্থতাকারীর কার্যকলাপ : ২৭
অপচয় ও আমলাতন্ত্র : ২৮
ফুয়াদ পাশা : ২৯
উসমানিদের অবনমন : ৩০
ভিনদেশে অফিসার প্রেরণ : ৩০
স্থলাভিষিক্ত (ক্রাউন প্রিন্স) নিয়োগের নিয়ম : ৩২
রুশ-তুর্কি যুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপট : ৩২
ক্রিট দ্বীপ : ৩৩
বাগদাদের রেলপথ : ৩৫
হারেমের আগাদের কথা : ৩৬
বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রহিতকরণ : ৩৭
মিদহাত পাশা ও তার যত অপরাধ : ৩৮
তুরস্কে ফ্রিম্যাসনের বিষফোঁড়া : ৩৯
ব্যবসার হালচাল : ৩৯
আরনাউত জাতি : ৩৯
আনাতোলিয়ার রেলপথ : ৪০
রুগ্‌ণ ব্যক্তির শক্তি : ৪১
উপদেষ্টাদের কথা : ৪১
তথ্য ও গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনা : ৪২
তুরস্কের রেলপথ : ৪৩
আনাতোলিয়ার রেলপথ প্রসঙ্গ : ৪৪

ডাকাতদের কথা : ৪৫
মেসিডোনিয়ায় ষড়যন্ত্রের জাল : ৪৫
মামদুহ পাশা : ৪৬
তুরস্কের প্রচলিত করসমূহ : ৪৭
তথাকথিত সংস্কারের বুলি : ৪৭
মেসিডোনিয়া অঞ্চলে বুলগেরীয় আন্দোলন : ৪৮
ঘুসের ইতিবৃত্ত : ৪৯
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি : ৫০
সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা : ৫০
সুলতানের সম্পদ : ৫১
উসমানি সাম্রাজ্যে বিদেশি ডাকবিভাগ : ৫২
মন্ত্রিপরিষদের কথা : ৫২
উসমানিদের দৈহিক অবনমন : ৫৩
বিবাচন : ৫৪
সামরিক পেশা : ৫৪
সীমাবদ্ধ শাসনব্যবস্থা : ৫৫
হেজাজের রেলপথ : ৫৬
মৌলিক আইনকানুন গ্রহণ : ৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : বৈদেশিক রাজনীতি

ফ্রান্স ও মিসর : ৬১
মিসরে ইংরেজদের কার্যকলাপ : ৬১
মিসর ও তুরস্ক : ৬২
সুলতান আবদুল আজিজের অসিয়ত : ৬৩
উসমানি সাম্রাজ্যে ক্রুসেড আক্রমণ : ৬৩
অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির প্রাচ্য রাজনীতি : ৬৪
মিসরে উসমানি শাসন : ৬৫
ক্ষুদ্র উপঢৌকন : ৬৬
রুশ রাষ্ট্রদূত ইভান অ্যালেক্সেভিচ জিনোভেফ : ৬৬
উসমানি সাম্রাজ্য ও জাপানের মধ্যকার সম্পর্ক : ৬৭
তুর্কি ও জার্মান সম্পর্ক : ৬৭
প্রাচ্যে জার্মান ও ফরাসি সমাচার : ৬৮
জার্মান সম্রাটকে দেওয়া অধিকার : ৬৯
রেলপথকে কেন্দ্র করে রাজনীতি : ৬৯
সার্বিয়া ও গ্রিসের মধ্যকার সম্পর্ক : ৭১
সুয়েজ খাল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা : ৭১
জার্মানি ও আনাতোলিয়া : ৭২

প্রাচ্যে ফরাসি আধিপত্য : ৭২
ইংল্যান্ডের উচ্চাভিলাষ : ৭৩
ইংল্যান্ড ও আরব দ্বীপাঞ্চল : ৭৪
বুলগেরিয়া : ৭৪
প্রাচ্যে জার্মান রাজনীতি : ৭৫
উসমানি সাম্রাজ্য ও গ্রিসের মধ্যকার সম্পর্ক : ৭৬
ফ্রান্স ও উসমানি সাম্রাজ্য : ৭৬
ইংল্যান্ড ও পারস্য উপসাগর : ৭৭
তুরস্ক ও বলকান রাষ্ট্রসমূহ : ৭৮
ইংল্যান্ড ও আরব দ্বীপাঞ্চল : ৭৮
ইংরেজদের অত্যাচার : ৭৯
রাশিয়া ও বাগদাদ রেলপথ : ৮০
রাশিয়ার প্রাচ্যরাজনীতি : ৮০
ভারতবর্ষে ইংরেজদের দুর্বলতা : ৮১
বেনগাজি : ৮১
বুলগেরিয়ানদের কূটচাল : ৮২
রোমানিয়া ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য : ৮২
রোমানিয়া : ৮৩
মেসিডোনিয়া ও বুলগেরিয়ানদের স্বেচ্ছাচার : ৮৪
সিরিয়া-ভারতবর্ষ রেলপথ : ৮৫
বুলগেরিয়া ও স্লাভিক সহিংসতাবাদী আন্দোলন : ৮৬
বুলগেরিয়া ও বলকান ঐক্য : ৮৬
ইংল্যান্ড ও গ্রেট বুলগেরিয়ান স্টেট : ৮৭
বুলগেরিয়া ও রোম : ৮৮
রাশিয়া : ৮৮
রাজা সপ্তম অ্যাডওয়ার্ড : ৮৯

তৃতীয় অধ্যায় : বিষয় ইসলাম

ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন : ৯৩
ইসলাম সভ্যতার ধর্ম : ৯৩
ইসলামের শাশ্বত বিশ্বাস : ৯৪
উদারতা : ৯৪
ভাগ্যবাদীদের কথা : ৯৫
ধর্মান্ধতা : ৯৬
ইসলামের প্রতি আহ্বান : ৯৭
ইসলামের প্রসার : ৯৭
পৃথিবীর বুকে ইসলামের গুরুত্ব : ৯৮

খেলাফত ও শিয়া সম্প্রদায় : ৯৯
ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী চেতনা : ৯৯
দেশপ্রেম : ১০০
ইসলাম গ্রহণকারীদের কথা : ১০০
সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ : ১০১
খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রতিরোধ : ১০১
ইসলামের অনুসারী ও ক্রুশের পূজারিদের মধ্যে বিরোধ : ১০২
দাসপ্রথা প্রসঙ্গ : ১০৩

চতুর্থ অধ্যায় : সংস্কারের রাজনীতি

স্কুল-কলেজ প্রসঙ্গ : ১০৭
কৃষিশিক্ষা : ১০৮
বিদেশি প্রতিষ্ঠানে উসমানিদের শিক্ষালাভ : ১০৮
উসমানিদের কাছে শিক্ষার মর্যাদা : ১০৯
উসমানিদের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও সাহিত্যের অবস্থান : ১০৯
ক্যালেন্ডার নবায়ন : ১১০
চিন্তাগত উন্নতি ও সংস্কার : ১১০
কথিত সংস্কার : ১১১
প্রাচ্য ও ইউরোপ : ১১২
ইউরোপীয় সভ্যতার বিষ : ১১২
জাতির অধিকার –আল-হিলালুল আহমার (রেড ক্রিসেন্ট) সংস্থা : ১১৩
মুসলিম নারী : ১১৩
অন্দরমহলের কথা : ১১৫
বেপরোয়া মনোভাব ও অলসতা : ১১৬
কাজের মূলমন্ত্র : ১১৬
উসমানিদের হতাশার চাষাবাদ : ১১৭

পঞ্চম অধ্যায় : ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ : ১২১
প্রাসাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ : ১২২
সঙ্গীত : ১২৩
কৃপণ আবদুল হামিদ : ১২৩
প্রাচ্যে নানা গুঞ্জন : ১২৪
গুপ্তচরবৃত্তি : ১২৫
পত্রপত্রিকার হামলা : ১২৫

প্রথম অধ্যায় : অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

ইয়াং তুর্ক মুভমেন্ট ও সংবিধান (১৮৯২ সাল)

এই জাতির সহজেই ভুলে যাওয়ার রোগ আছে। পর্দার আড়ালে কী কী ষড়যন্ত্র ঘটছে, বড় বড় রাষ্ট্রগুলো কেমন শত্রুতার জাল ফাঁদছে, এসব না দেখে যারা আমার রাজনৈতিক বিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তাদের প্রতি বিনীত ওজর পেশ করে আমি এ কথাটি বলতে বাধ্য হলাম।

বর্তমানে পরিস্থিতি যতটা শোচনীয় রূপ নিয়েছে, এর পিছনে একমাত্র কারণ আমার অসুস্থ ভাইয়ের[১] শাসনামলে তুর্কি ইয়াং ফেডারেশনের সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা। সুয়াবি আফেন্দি[২] লন্ডনে আর মুস্তফা ফুজাইলি ব্রাসেলসে ঘোষণা দিয়েছে, তুর্কি জাতিসত্তা দুর্বল হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে উসমানি শাসনতন্ত্রের অধঃপতন হয়েছে। এই কথা বলে তারা আদতে নিজ মাতৃভূমিরই সম্মানহানি করেছে। তাদের মধ্যে যদি আত্মসম্মানবোধের ছিটেফোঁটা থাকত, কখনোই মাতৃভূমির জন্য এমন অপমান বয়ে আনতে পারত না। তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া বেক সম্ভ্রান্ত লোক। তার চাহিদা খ্রিষ্টান-মুসলিম সমঝোতা প্রতিষ্ঠা এবং দ্রুততরো সময়ে মজলিসে মাবুশান[৩] গঠন করা, যাতে শাসনতন্ত্রের দুর্বল চাকা দ্রুতই সচল করা যায়।

---

[১] সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের ভাই সুলতান পঞ্চম মুরাদ। ১২৫৬ হিজরি মোতাবেক ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর তার জন্ম। ১২৯৩ হিজরির ৭ জমাদিউল উলা মোতাবেক ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ মে তিনি খেলাফতের আসনে বসেন। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, সজ্জন এবং সংশোধনকামী ব্যক্তি। প্রজাদের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। যাবতীয় কার্যকলাপে মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী। অপচয়কে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। খেলাফতে বসার তিন মাস যেতে না যেতেই তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসেন। এরপরই তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ই আগস্ট তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, ৬৩ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[২] তার নাম আলি সুয়াবি আফেন্দি। জন্মস্থান বুখারায়। শিক্ষালাভের জন্য তিনি আসতানায় (বর্তমান কাজাখাস্তানের রাজধানী নুর সুলতান শহর) গমন করেন এবং আরবীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তবে তার মনোভাব ছিল কুচক্রী। এজন্য তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। একাধারে নয় বছর সে নিজ রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করে। অতঃপর মিদহাত পাশার প্রচেষ্টায় সে পুনরায় ফিরে আসে। অতঃপর তাকে সুলতানি লাইব্রেরির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। সুলতান আবদুল হামিদের সন্তানরা এখানে পড়াশোনা করত। তাকে এই পদ থেকেও বরখাস্ত করা হয়। এরপর সে সুলতান মুরাদকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য চক্রান্তের পরিকল্পনা করতে থাকে। কিন্তু সেই সুযোগ তার আর হয়ে ওঠেনি। হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে তার যাবতীয় চক্রান্তের অবসান ঘটে। বিস্তারিত জানতে পড়ুন, তারিখুদ দাওলাতিল উলইয়াতিল উসমানিয়া, মুহাম্মদ ফরিদ বেক, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

[৩] উসমানি সালতানাতের সংসদের দুইটি স্তর ছিল। প্রথম স্তরটি ছিল মাজলিসুল আইয়ান বা সিনেট। আর দ্বিতীয় স্তরটি ছিল মাজলিসে মাবুশান বা চেম্বার অব ডেপুটিস। –অনুবাদক

এখন তারা আমার প্রতি ভীরুতার অপবাদ দেয়। আমি নাকি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে স্বপ্রণোদিতভাবে শরিক হইনি। তারা হয়তো ভুলে গেছে এই আন্দোলনের জন্য আমাকে কেমন মর্মান্তিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমার চাচা আবদুল আজিজকে[১] ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। এরপর ঘটেছে তার রহস্যজনক আত্মহত্যার ঘটনা। অতঃপর আমার ভাই মুরাদ হয়ে গেলেন পাগল। তাকে বন্দি করা হল কারাগারে।

আর্মেনীয়দের অবান্তর অভিযোগ (১৮৯১ সাল)

আর্মেনীয়দের উপর নিপীড়নের যে মিথ্যা অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে আনা হয়, তা নিতান্তই হাস্যকর। কেউ যদি আমাদের সালতানাতের ইতিহাস খতিয়ে দেখে, তার বদ্ধমূল ধারণা হবে, আর্মেনীয়রা সবসময়ই সম্পদশালী ছিল। যারা আমাদের রাষ্ট্রের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তারা আমাদের সাধারণ মুসলিম প্রজাদের তুলনায় আর্মেনীয়দের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা একবাক্যে স্বীকার করে নেবে। প্রধান উজিরের পদসহ রাষ্ট্রের সকল উচ্চপদে তারা আসীন হয়েছে। যদি বলি রাষ্ট্রের কর্মচারীদের এক-তৃতীয়াংশই আর্মেনীয়, কিছুতেই তা বাড়িয়ে বলা হবে না। এর বাইরে আর্মেনীয়দের সামরিক সেবা প্রদানেও বাধ্য করা হয় না। এক্ষেত্রে তারা অন্য প্রজাদের মতোই স্বাধীন। এর বিপরীতে তারা যে আর্থিক বিনিময় প্রদান করে থাকে, তা অতি সামান্য। যেসময় মুসলিমরা সামরিকখাতে ব্যয় করত, সেই তুলনায় তাদের এই অর্থ উল্লেখ করার মতোই নয়। অথচ, ব্যবসাখাতে আর্মেনীয়রা আছে সমৃদ্ধ অবস্থানে। এমন অবস্থার পর যদি রাষ্ট্রীয় কর অধিদপ্তর শুধু তাদের উপরেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ত, এতে আশ্চর্য বা আপত্তির কিছু ছিল না। এ ছাড়াও রশিদ পাশার প্রস্তাবে খলিফা আবদুল মাজিদ যখন কর আদায় বাধ্যকরণ আইন পাশ করতে যাচ্ছিলেন, তখন আর্মেনীয়রা তা রহিত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। নিজেদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা একচুলও নড়েনি। অবশেষে তারা চাপপ্রয়োগ করে সেই আইন রহিত করতে সক্ষম হয়। সফল হয় নিজেদের সকল সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখার ব্যাপারে।

তবে কুর্দি পর্বতশ্রেণিতে যেসব আর্মেনীয় মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে, তাদের কথা আলাদা। এর বাইরে আর্মেনীয়রা সাধারণত বেশ সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী। এদের মধ্যে অবশ্য কিছু রোমানও আছে। এই কথা আলোর মতো সত্য যে,

[১] সুলতান আবদুল আজিজ। উসমানি সালতানাতের বত্রিশতম সুলতান এবং চব্বিশতম খলিফা। ১৮৩০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তার জন্ম। ১৮৬১ সালে তিনি উসমানি সালতানাতের ক্ষমতায় বসেন এবং ১৮৭৬ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন। ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চারদিন পর চেরাগান প্রাসাদে (Feriye Palace) আত্মহত্যা করে মারা যান।

আমাদের ভূমির ঐশ্বর্য থেকে কীভাবে ফায়দা লুটতে হবে, ওই লোকগুলি সেই কায়দাকানুন খুব ভালোভাবেই রপ্ত করেছে।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসন (১৮৯৩ সাল)

আমাদের সাম্রাজ্যের চলমান অরাজক পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য এখন সবচেয়ে দরকারি কাজ হচ্ছে, উপযুক্ত পন্থায় অভিবাসনপ্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা। তবে ইহুদিদের অভিবাসিত করা আমাদের জন্য আসলেই উপযুক্ত কি না, সেটা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না।[১] অনেকদিন হয়ে গেছে আমাদের সমাজে বিধর্মীদের অনুপ্রবেশের। শরীরে বিদ্ধ হয়ে থাকা কাঁটার মতো তারাও গেঁথে আছে আমাদের সমাজে। আমাদের ভূখণ্ডে আমরা কেবল তাদেরকেই গ্রহণ করতে পারি, যারা আমাদের স্বজাতির এবং আমাদের মতো একই বিশ্বাস লালন করে। তুর্কি জাতিগোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বসনিয়া হার্জেগোভিনা ও বুলগেরিয়ায় মুসলিমদের অভিবাসনের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করে সে অঞ্চলে মুসলিম-অধিবাস বাড়াতে হবে।

এই অভিবাসনের ফায়েদা শুধু স্বদেশী শক্তির বৃদ্ধি ঘটানোতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং এর পাশাপাশি আমাদের সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে আনাতোলিয়া ও রোম সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে তুর্কি জাতিগোষ্ঠীকে শক্তিশালী করা এবং কুর্দিদের সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার পূর্বেকার শাসকদের সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে, তারা স্লাভিক জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাতের চেষ্টা না করে তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। তবে বাস্তব কথা হচ্ছে, এই বিষয়টি মোটেই সহজ নয়। যদিও সে সময় রোমীয়রা খুব সহজেই আর্মেনীয়দের সঙ্গে মিশে যেতে পারত।

সর্বোপরি প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাঁর অনুগ্রহে আমাদের বৃথা রক্তপাতের শিকার হতে হয়নি।

সংবিধান (১৮৭৬-১৮৭৮ সালের পরিস্থিতিসংক্রান্ত ভাবনা)

একটা কথা না বলে পারছি না, এমন ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে মূলত দায়ী কে? মিদহাত পাশা, রুশদি ও নুরির মতো ব্যক্তির উপর আমি কীভাবে ভরসা করতে পারি? শেষোক্ত দুই ব্যক্তি আবার ছিলেন আমার চাচা আবদুল আজিজের ঘনিষ্ঠ লোক। একদিকে তারা আমাকে পথের কাঁটা মনে করে, আবার দাবি করে তাদের প্রস্তাবিত এই সংবিধানের মাধ্যমে তারা উসমানি সালতানাতকে সভ্যতার চূড়ায় নিয়ে যাবে। বিষয়টি কি হাস্যকর মনে হচ্ছে না?

[১] থিওডোর হারজেল এবং রথসচাইল্ড পরিবার ইহুদিদের ফিলিস্তিনে স্থানান্তরের ব্যাপারে যে প্রস্তাব পেশ করেছিল, তা নিয়ে বলা হচ্ছে।

আপনি যদি নেকড়ের পালের মধ্যে থাকেন, তবে আপনাকেও ঘেউ ঘেউ করতে হবে। এখন ভালো-মন্দ বিবেচনা করা বাদ দিয়ে আমার জন্য মজলিসে মাবুশান খুলে দেওয়া এবং সংবিধানের ঘোষণা দেওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হবে, আমি যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ সম্পাদন করেছি।

কুর্দি ব্রিগেড গঠন করার পর ইউরোপীয় পত্রিকাগুলো আমার চরম সমালোচনা করতে থাকে। তাদের দাবি এই ব্রিগেড গঠন করার পর কুর্দিরা আর্মেনীয়দের উপর অমানবিক কর্মকাণ্ডের হার বাড়িয়ে দিয়েছে। পত্রিকাগুলো এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে যে, এর পরিপ্রেক্ষিতে কুর্দিরা হয়তো খুব শীঘ্রই স্বাধীন সাম্রাজ্যের ঘোষণা দিয়ে বিদ্রোহ করে বসবে।

এসবের পিছনে যে পত্রিকাগুলোর প্রভূত স্বার্থ রয়েছে তা অজানা নয়। সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে তারা যা সামনে পাচ্ছে তাই লিখে যাচ্ছে। ইস্তাম্বুলের আরামদায়ক বাসভবনে বসে বসেই রিপোর্টাররা আর্মেনীয়দের উলঙ্গ পক্ষপাত করে কুর্দিস্তানের যা-তা বিবরণ লিখে পাঠাচ্ছে। সরেজমিনে গিয়ে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার কষ্টটুকু স্বীকার করার কোনো চিন্তাই তাদের মাথায় নেই।

যদিও কয়েকজন পাশা কুর্দি ব্রিগেড গঠনের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের আপত্তি ছিল ব্যক্তিগত ঈর্ষা এবং আক্রোশপ্রসূত। কারণ, এই কুর্দি ব্রিগেডের নেতৃত্বে ছিলেন তাদের সহকর্মী জাকি পাশা, যিনি ইতিপূর্বে এরজুরুমে চতুর্থশ্রেণির সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন।

রাশানদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ শুরু হবে তখন এই উচ্চপ্রশিক্ষিত কুর্দি বাহিনী উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তখন তাদের মাথায় ক্রমাগত ঘুরতে থাকা আনুগত্যের ভাবনা তাদের জন্য অনেক উপকারী হবে। আর তাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয়, আমরা যাদের উচ্চ সামরিক পদে বসিয়েছি; তারা এ নিয়ে গর্বে বুক ফুলিয়ে বেড়াবে। দেখা যাবে, তাদের অনেকে প্রশাসনিক পদ লাভ এবং আঞ্চলিক প্রশাসক হওয়ার চেষ্টাও চালাবে। সেদিন অচিরেই আসবে, যেদিন কুর্দিদের মাধ্যমে গঠিত এই হামিদিয়া বাহিনী নিয়ে কানাকানি বন্ধ হবে এবং এই বাহিনী সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত হবে।

আমি জানি, নেতৃস্থানীয় কিছু কুর্দি পরিবারের সন্তানকে সাম্রাজ্যের রাজধানীর প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করে আমাকে বেশ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। এদিকে আর্মেনীয়রা যে অনেক বছর ধরেই মন্ত্রিপদে বসে আছে, সেদিকে কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু যখন আমি আমাদের স্বধর্মীয় কুর্দি ভাইদেরকে কাছে টানতে গিয়েছি তখন কেন তাদের গা জ্বলে উঠল? আবার বেদির খানের[১] পরিবারকে

[১] এই বেদির খান ছিলেন কুর্দি জাতিগোষ্ঠীর নেতা, যিনি সুলতান আবদুল হামিদের ক্ষমতায় বসার নিকটকালেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

আমি কেন দেখাশোনা করতে গেলাম, এ নিয়েও আমাকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। তাদের দাবি, এরা নাকি সাম্রাজ্যের জন্য বিপজ্জনক। যেহেতু প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার রয়েছে, যে যার মতো চিন্তা করুক। আমার কী আসে যায়!

কিন্তু আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, কুর্দিদের ব্যাপারে আমি যে রাজনীতির অনুসরণ করেছি, এতে আমি বিন্দুমাত্র ভুল করিনি। সেনা অফিসার জাকি পাশা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে এই কুর্দি ব্রিগেড গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় তার এই প্রস্তাব ছিল সবচেয়ে উত্তম পন্থা। আমাদেরকে প্রায় প্রতি কাজেই সমালোচনার শিকার হতে হয়। তাই দেখবেন এইসব সমালোচনা আমরা মোটেই পাত্তা দিই না।

ইহুদি সংকট (১৮৯৫ সাল)

ইহুদিরা প্রাচ্যের চেয়ে ইউরোপে বেশি শক্তিশালী অবস্থানে আছে। এজন্যই অধিকাংশ ইউরোপীয় রাষ্ট্র ফিলিস্তিনে ইহুদিদের স্থানান্তরকে চমৎকার পদক্ষেপ হিসেবে ব্যক্ত করে। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ইউরোপে ক্রমাগত বাড়তে থাকা এই সেমিটিক জাতিগোষ্ঠী থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।

কিন্তু আমাদের ভূমিতেও ইহুদিদের সংখ্যা কম নয়। আমাদের আরব জাতিগোষ্ঠীকে সমুন্নত অবস্থানে রাখতে হলে অভিবাসী ইহুদিদের ফিলিস্তিনে আবাসন গড়তে দেওয়ার চিন্তা বাদ দিতে হবে। ইহুদিরা যখন কোনো অঞ্চলে বসবাস শুরু করে অল্প সময়ের মধ্যে তারা সে অঞ্চলের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়। ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনে বসবাসের অনুমতি দেওয়ার মানে হচ্ছে, সেখানে বসবাসরত মুসলিমদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া।

জায়োনিস্টদের প্রধান থিওডোর হারজেল কিছুতেই তার চিন্তা দিয়ে আমাকে বশ করতে পারবে না। তিনি বলেছেন, ইহুদিসংকটের সমাধান সেদিনই হবে, যেদিন তার হাত ধরে ইহুদিরা শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে যাবে। তার দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা ঠিক আছে। তিনি তার ইহুদি ভাইদের জন্য একটি নিরাপদ ভূখণ্ড গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তিনি একটি কথা ভুলে যান যে, সকল সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু বুদ্ধিমত্তাই যথেষ্ট নয়।

তারা ফিলিস্তিনে শুধু কৃষিকাজের উপর থেমে থাকবে না; বরং কিছুদিনের মধ্যেই তারা সরকার গঠন এবং নিজেদের মধ্যকার প্রতিনিধি নির্বাচনের মতো কার্যকলাপেও আগ্রহী হয়ে উঠবে। তাদের এই উচ্চাশা আমি খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু ইহুদিরা অতিমাত্রায় এই ধারণা করে যে, আমি তাদের এই চেষ্টা একদিন ঠিকই মেনে নিব। তারা ভাবে আমি যেমন উচ্চ মন্ত্রণালয়ে ইহুদি

প্রজাদের অবদান তুলে ধরি, তেমনি একদিন ফিলিস্তিনের ব্যাপারে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও লালসাও পূরণ করব।[১]

[১] ইহুদিদের এই আকাঙ্ক্ষা ও লালসার কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় অবশেষে সুলতান নিজেকে খেলাফত থেকে সরিয়ে নেন। আরেকটি কারণ ছিল তার খেলাফতের ইতিহাস বিকৃতি ও নেতিবাচক সমালোচনায় ভরিয়ে তোলা। সুলতানের নিজের হাতে লিখিত ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষমতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পর এর কারণ ব্যক্ত করে সুলতান আবদুল হামিদ দামেশকের শাজিলি তরিকার শাইখ মাহমুদ আবুশ শামাতের কাছে একটি চিঠি পাঠান। প্রফেসর সাইদ আফগানি কুয়েত থেকে প্রকাশিত 'আল-আরাবি' পত্রিকার ১৩৯২ হিজরির শাওয়াল মোতাবেক ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় 'সুলতান আবদুল হামিদের অপসারণের কারণ' শীর্ষক নিবন্ধে চিঠিটি প্রকাশ করেন। নিবন্ধটির নির্বাচিত কিছু অংশ আমরা এখানে উল্লেখ করছি:- ইত্তেহাদ পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালীন শাইখ মাহমুদ আবুশ শামাত চিঠিটি নিজের হেফাজতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সিরিয়া থেকে তুর্কি শাসনের অবসান ঘটলে তার কাছের কিছু লোক চিঠিটির ব্যাপারে জানতে পারেন। শাইখের মৃত্যুর পর তার সন্তানরাও চিঠিটি সংরক্ষণ করেন। এটি যেহেতু অনেক মূল্যবান একটি বিষয় ছিল, তাই এ নিয়ে লোকদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও কেবল নিজেদের বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন লোকদেরকেই তারা এ বিষয়ে অবগত করেছিলেন। কিন্তু কালের ধূলিতে একটা সময় চিঠিটি যখন ক্ষয় হতে শুরু করে, তখন তারা এটি জনসম্মুখে প্রকাশ করেন। শাইখের ছেলেদের কিছু বন্ধু, যারা ছিল দামেশকের গণ্যমান্য ব্যক্তি; তারা শাইখের ছেলেদেরকে বুঝিয়েসুঝিয়ে আমার পর্যন্ত চিঠিটি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। যেহেতু এখন আর সেটি লুকিয়ে রাখা বৈধ হয় না। নয়তো একটি সত্য ইতিহাস পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। এর মাধ্যমে অনেক আলিম ও গবেষক নিজেদের ভুল এবং মিথ্যা দাবি সংশোধন করে নিতে পারবে। শাইখের উত্তরসূরিরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং ১৯৭২ সালের শুরুর দিকে আমাকে চিঠিটি ধার দেয়। আমি সেটি প্রিন্ট করে রেখে মূল চিঠিটি তাদের ফিরিয়ে দিই।

শাইখের উত্তরসূরিদের এক বিদ্বান বন্ধু চিঠিটির আরবি অনুবাদ করেন। যিনি আরবি-তুর্কি উভয় ভাষাতেই দক্ষ ছিলেন। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে চিঠিটির আরবি অনুবাদ লিখে দেন। তারা আরবি সংস্করণটিকেও মূল চিঠির মতোই হেফাজতে রাখেন। সেই অনূদিত চিঠিটি এখানে উল্লেখ করছি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়া বিহি নাসতাইন :

(শুরু করছি পরম দয়ালু আল্লাহর নামে এবং তার কাছেই সাহায্য কামনা করি)

হামদ ও সালাতের পর...

সম্ভ্রান্ত শাজিলি তরিকার সম্মানিত শাইখ, আমার আত্মিক চেতনার উৎস শাইখ মাহমুদ আফেন্দি আবুশ শামাতের কাছে আমি আমার এই আরজি পেশ করছি। আমি তার পবিত্র দুই হাতে চুমো খাই এবং তার নেক দাওয়াতি মিশনকে অভিবাদন জানাই।

যথাবিহিত সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক জানাচ্ছি যে, এই বছরের ২২ মে, আমি আপনার লেখা চিঠি হাতে পেয়েছি এবং আপনি সুস্থ ও নিরাপদ আছেন জেনে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করেছি।

সম্মানিত শাইখ, আল্লাহ তায়ালার তাওফিকে আমি দিনরাত আপনার বলে দেওয়া শাজিলি তরিকার আমল করে যাচ্ছি এবং বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি, আমি সর্বদা আপনার আন্তরিক দোয়ার মুখাপেক্ষী।

ভূমিকার পর আমি আপনার মতো উদার, বুদ্ধিমান এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির কাছে ইতিহাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমানত হিসেবে জানাতে যাচ্ছি :

আমার খেলাফত থেকে সরে যাওয়ার পিছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে, জোয়ানে তুর্ক (তুর্কি ইয়াং ফেডারেশন) নামে পরিচিত জমইয়াতে ইত্তেহাদের (কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস) অব্যাহত চাপ এবং হুমকি। তাদের কারণেই আমি অপারগ হয়ে খেলাফত ছাড়তে বাধ্য হয়েছি।

ঐ সংগঠনের সদস্যরা আমাকে বারংবার চাপ দিয়েছে, যেন আমি পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতিগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সম্মত হই। তদুপরি আমি কিছুতেই তাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হইনি। সবশেষে তারা আমাকে দেড়শ মিলিয়ন লিরা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। আমি এই প্রস্তাবও স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করি।

বুরসা ও কেন্দ্রীয় শাসন

উজির সাইদ পাশা আমার বাসস্থানকে বুরসায় স্থানান্তর করে সেখানে সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে আমি যারপরনাই হতভম্ব হয়েছি। এই প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। আমাদের গৌরবময় অতীত ইস্তাম্বুলের সঙ্গে আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে। আমাদের ঐতিহাসিক সকল মসজিদ এবং পবিত্র আমানতের অবস্থান এই শহরের বুকেই। এ ছাড়া সমস্ত মন্ত্রণালয় ও কর্মজীবীদের বুরসায় স্থানান্তর করতে গেলে কয়েক মিলিয়ন লিরা খরচ করতে হবে।

অপরদিকে ইস্তাম্বুল যে বারুদের তোপের মুখে রয়েছে, এটিও বাস্তব সত্য। তাই সাইদ পাশার উত্থাপিত প্রস্তাবটি যথাযথভাবে চিন্তাভাবনা করার দাবি রাখে। রুশরা যদি দ্বিতীয়বার ইস্তাম্বুলের উপকণ্ঠে চলে আসে তখন আমাদের কী পরিণতি হবে তা স্পষ্ট। খুব সহজেই তারা শহর দখল করে নেবে। এর মানে সব শেষ। ইস্তাম্বুলকে হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা খেলাফতকেও হারিয়ে ফেলব। অচিরেই খেলাফত অনিবার্যভাবে আরবদের কাছে ফিরে যাবে।

হাদিয়া-বখশিশসংক্রান্ত সমস্যা (১৮৯৬ সাল)

ফরাসি, ইংরেজ, জার্মান অথবা যেকোনো বিদেশি লোক আমাদের দেশ নিয়ে লিখতে গেলে সবার আগে আমাদের হাদিয়া-বখশিশ দেওয়া-নেওয়ার অভ্যাস নিয়ে একটি

জবাবে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় বলে দিই: 'দেড়শ মিলিয়ন কেন, তোমরা যদি সারা পৃথিবীর সমান স্বর্ণমুদ্রাও আমার সামনে এনে পেশ কর, আমি কিছুতেই তোমাদের এই ষড়যন্ত্র মেনে নেব না। ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে আমি ইসলামি বিশ্ব এবং মুসলিম উম্মাহর সেবা করেছি। আমার পূর্বপুরুষ উসমানি সুলতান ও খলিফাগণের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আমি কিছুতেই কলঙ্কিত করতে চাই না।'

এই অকাট্য জবাবের পর তারা আমাকে অপসারণ করার ব্যাপারে একমত হয় এবং আমাকে জানানো হয়, তারা আমাকে থেসালোনিকিতে নির্বাসিত করবে। আমি তাদের সর্বশেষ এই ষড়যন্ত্র মেনে নিই।

তবু আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করি যে, আমি তাদের ষড়যন্ত্র ও চাপের শিকার হয়ে উসমানি সাম্রাজ্য এবং ইসলামি বিশ্বের জন্য ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চির লজ্জাজনক এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিনি। এরপর যা হওয়ার তাই হল। এজন্য আমি বারবার আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করি। আমি বিশ্বাস করি, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বুঝাতে আমি যেটুকু তথ্য দিয়েছি, তাই যথেষ্ট। এই বলেই আমি আমার চিঠির ইতি টানছি।

আপনার বরকতময় দুটি হাতে আমি চুমো খাই। আশা করছি, আপনি আমার সালাম ও সম্মান গ্রহণ করে সকল ভাই-বেরাদার ও বন্ধু-বান্ধবকে জানাবেন।

সম্মানিত ওস্তাদ, আপনার উদ্দেশে প্রেরিত এই চিঠিতে অনেক দীর্ঘ কথা বলে ফেলেছি। কিন্তু আপনাকে এবং আপনার সকল অনুসারীকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানাতে আমাকে এই দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণায় যেতে হয়েছে। আপনার উপর আল্লাহ তায়ালার শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯১১; ১৩২৯ হিজরি

বিনীত

মুসলমানদের সেবক

আবদুল হামিদ বিন আবদুল মাজিদ

শিরোনাম অবশ্যই রাখবে। এমনকি এক ফরাসি লেখক তার বইয়ে উল্লেখ করেছে, হাদিয়া সুলতান থেকেও উচ্চপর্যায়ের সুবিধা। এমনকি তারা বলে থাকে, সুলতান হলেই হাদিয়া পাওয়া যায়। তাদের এ সকল কথা অতিরঞ্জন বৈ কিছু নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, পশ্চিমারা হাদিয়ার পরিপূর্ণ অর্থ সম্পর্কে অবগত নয়। এটিকে তারা ঘুসের মতো অনৈতিক কাজ মনে করে থাকে। তবে এমনটি খুবই দুর্লভ বলে মনে হয়। এ-দিকে আমাদের অঞ্চলের তুলনায় কায়সার তথা রোম সম্রাটদের শাসিত অঞ্চলে তাদেরকে হাদিয়া-উপঢৌকন দেওয়ার প্রচলন অধিক ছিল। তবে এ কথা বলা যায় যে, হাদিয়া ছাড়া কোনো কিছু বাস্তবায়িত না হওয়ার যে প্রচলন তাদের মাঝে রয়েছে, সেটি আমাদের মাঝে একদমই নেই। মূল বিষয় হচ্ছে, কয়েক যুগ আগে ইউরোপের যেসব প্রচলন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সেগুলো এখনও আমাদের কাছে অক্ষত আছে। যেমন, পশ্চিমাদের কাছে কোনো ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট ছিল না (অবশ্য এখন আমাদের অবস্থা এমনই)। যার ফলে তাদের কর্মজীবীদের জীবিকানির্বাহের জন্য অনেক অন্যায় ও অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে হতো। এমনও জানা গেছে, পশ্চিমাদের কতক পাদরি ধর্মানুরাগী জনতার দেওয়া হাদিয়া-উপঢৌকনের উপর নির্ভর করেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তাই ইউরোপীয় লেখকদের জন্য কখনোই এই সুযোগ নেই যে, তারা ইউরোপের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের কর্মকর্তাদের হাদিয়া গ্রহণ নিয়ে সমালোচনা করবেন। যেখানে তাদের কর্মকর্তারা সম্পদের গদির উপর হেলান দিয়ে বসে থাকে, তাদের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের কর্মকর্তাদের সমালোচনা করা একেবারেই অযৌক্তিক। হাদিয়া-বখশিশের জন্য অপেক্ষা করার কারণে যে কর্মজীবীকে অভদ্র ও দুর্নীতিবাজের মিথ্যা তকমা দেওয়া হয়, মূলত তার জন্য আমাদের সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে নির্ধারিত বেতনে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব নয়। তাই জনগণের কাজ করে দেওয়ার বিনিময়ে তারা যে অর্থ প্রদান করেন, সেটিকে তিনি নিজের স্বাভাবিক অধিকারের মতোই মনে করেন। এমনিভাবে জনগণও এটিকে স্বাভাবিক বিষয়ই মনে করেন। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে চলতে থাকা এই অভ্যস্ততা হাদিয়াকে একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিচয় দান করেছে। কিন্তু একজন বিদেশির পক্ষে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী চিন্তা করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে তাদের জন্য সম্ভব নয় উসমানি সাম্রাজ্যের কর্মজীবীদের স্তরভেদ সম্পর্কেও অনুধাবন করা। সবার আগে লক্ষ করতে হবে, আমাদের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে আমরা কর্মজীবীদের মাসিক বেতন-ভাতা সুষ্ঠুভাবে প্রদান করতে পারছি না (জনগণ দরিদ্র হয়ে গেলে সাম্রাজ্যও দুর্বল হয়ে পড়ে)।

এ কারণে পরিবারের সদস্যরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় হাদিয়া-সহায়তার জন্য অপেক্ষা করেন। এটি নিছক একটি মানবিক বিষয়, যা অনুধাবন করা উচিত। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে, যেকোনো জাতির কর্মজীবীদের পরিস্থিতি যদি উসমানি সাম্রাজ্যের

পরিস্থিতির মতো হয়, তাহলে আমাদের কর্মজীবীরা এখন যেমনটি করছে, তারাও তেমনটি না করে পারবে না।

নিঃসন্দেহে হাদিয়া গ্রহণের অভ্যাস সাম্রাজ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর। এতে করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় থেকে বিরাট একটি অংশ কমে যায়। কিন্তু এই পরিস্থিতির সংশোধনে এখন আমরা কী করতে পারি? আমাদের প্রত্যেক বিশ্বস্ত কর্মচারীই হাদিয়াকে অধিকার মনে করছে। তাই আমাদের অর্থনৈতিক নিয়মকানুনে আমূল পরিবর্তন আনা ছাড়া এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় দেখছি না। আমাদের আয়ের জন্য অন্য কিছু খাতের উদ্ভাবন এক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। তবে সবকিছুর আগে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে স্বীকার করে নিতে হবে, তারা আমাদের শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনযাপনের অধিকার নিশ্চিত করবে, যাতে আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ কিছুতেই বিদেশিদের নানা ষড়যন্ত্র দমন করতে গিয়ে খরচ না করতে হয়।

বনাঞ্চলের সুরক্ষা (১৮৯৬ সাল)

আনাতোলিয়ার বনাঞ্চল উজাড় করা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ না করা নিয়ে আমাদের বেশ অভিযোগের মুখে পড়তে হয়েছে। যদিও আমরা ইউরোপে গিয়ে বনাঞ্চলের সুরক্ষা ও পরিচর্যা সম্পর্কে জানার জন্য একটি দল প্রেরণ করেছিলাম এবং গাছপালার পরিচর্যায় বেশ কিছু উদ্যোগও নিয়েছিলাম, তবু প্রথম অভিযোগটি মেনে নিচ্ছি। সর্বাবস্থাতেই আমরা উপযুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণ এবং আমাদের অধীনে সামান্য যা বনাঞ্চল রয়েছে, তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

কিন্তু বনাঞ্চল উজাড় করে দেওয়ার যে দাবি তারা করছেন, তা একেবারে ভিত্তিহীন অপবাদ। আমরা যখন ক্ষমতা হাতে নিই, আমাদের সীমানায় কোনো বনাঞ্চল ছিল না বললেই চলে। যতটুকু ছিল তা প্রাচীন গ্রিস, ভেনিস এবং জেনোয়ার অধিবাসীরা সেই মধ্যযুগেই নিঃশেষ করে গিয়েছে। এ ছাড়া কালপরিক্রমায় আমাদের বনাঞ্চলের জন্য সবচেয়ে বেশি হুমকি ছিল মেষপাল, দীর্ঘকাল থেকে লোকেরা যেগুলো লালন-পালন করে অভ্যস্ত। বকরি তো শুধু গাছের পাতা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু মেষপাল একটি গাছ গোড়া থেকে উঠিয়ে, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। এভাবেই তারা বৃক্ষ উজাড় করায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। এখন আমাদের বনাঞ্চলের সুরক্ষা ও পরিচর্যায় নতুন করে সফলতা পেতে চাইলে মেষ পালন ও তার প্রজনন সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে।

আর্মেনীয় সংকট (১৮৯৬ সাল)

আর্মেনীয় সংকট প্রসঙ্গে অনেক লেখালেখি হয়েছে। আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে তার চেয়ে বেশি। ১৮৭৭ সালে বায়েজিদ শহরে রক্তপাত ঘটিয়ে আর্মেনীয় বিদ্রোহ দমন আমাদের উপর ইউরোপীয়দের রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়।

আর্মেনীয়দের ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখার যে দাবি তারা করে, এগুলো শুধু দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের বুলি।

বার্লিন সম্মেলনের সময়ে ইংরেজরা আর্মেনীয়দের সুযোগ-সুবিধার প্রসঙ্গটি অবতারণা করে। তাদের ছাড়া অন্য কোনো বড় রাষ্ট্রকে আর্মেনীয়দের স্বার্থরক্ষায় সরব হতে দেখা যায়নি। কেননা, আদতে এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজি পত্রিকাগুলোর দাবি হচ্ছে, এই সকল বিদ্রোহ সৃষ্টির পিছনে শাসনতন্ত্রই দায়ী, প্রজারা নয়। তবে প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, আর্মেনীয় সংকট প্রসঙ্গে এই যুক্তি একদম বেমানান। কারণ, আর্মেনীয়রা প্রকাশ্য আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করে এমন জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যার সমাধান কঠিন। আর্মেনীয়রা স্বভাবগতভাবেই লোভী এবং ভোগ-বিলাসের প্রতি আসক্ত। তাদের এই বিদ্রোহের পেছনে কোনো না কোনো কারণ তো অবশ্যই আছে। অ্যাংলো-আমেরিকান ধর্মপ্রচারকরা আমাদের সালতানাতের পূর্বাঞ্চলে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের প্রচারণার সময় মুসলিমদের সঙ্গে বেশ সহিংস আচরণ করেছিল। আর্মেনীয়রা এসেও তাদের পূর্বসূরিদের মতো একইরকম বিদ্বেষ ও সহিংসতার এজেন্ডা হাতে নিয়েছে। ভেবেছে, তাদের পূর্বসূরিরা যেভাবে পার পেয়ে গেছে, তেমন করে তারাও নির্বিঘ্নে এই সকল অপকর্ম সংঘটন করে পার পেয়ে যাবে।

সবচেয়ে হাস্যকর কথা ছিল আর্মেনীয়দের এই সকল সংঘর্ষ পরিকল্পিত ছিল না বলে দাবি করা! এই সংকটের সূচনা হয়েছিল ১৮৬৫ সালে মার্জিগুনে তাদের ধর্মীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর। এখানকার কিছু ছাত্র শিক্ষাসমাপনের পর আর্মেনীয়দের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সংগঠন সৃষ্টির পরিকল্পনা করে। তখনই প্রকাশ পায়, এথেন্সের বিদ্রোহী আর্মেনীয় সংগঠন আমাদের সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর কিছুদিন পর এন্ড্রু রিডগরি নামক একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৬৬ সালের নববর্ষের সময়ে তারা আর্মেনীয় গির্জাগুলোর দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে দেয়। সেখানে তাদেরকে প্রচ্ছন্নভাবে অবাধ্যতার ঘোষণা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এখন বলুন, তাদের এমনসব কার্যকলাপের পরও আমরা যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছিলাম, পৃথিবীর আর কোনো রাষ্ট্র কি এমন সহিষ্ণুতা দেখাবে?

সময় যত অতিবাহিত হয়েছে আর্মেনীয়দের ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়েছে এবং আমাদের লোকেরা টিকতে না পেরে তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে।

রাশিয়াতে দীর্ঘ সময় ধরে ইহুদিনিধন চলেছে। তখন কি কথিত বড় রাষ্ট্রগুলি তাদের খ্রিষ্টান ভাইদের নিষেধ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে? কিন্তু বিষয়টি যখনই মুসলিমজাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে, তখনই তারা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে।